লোকটি ছিল মিথ্যুক

অনুবাদকের কথা

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। উপমহাদেশের ইতিহাসে এক কালোঅধ্যায়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবের পর ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি অনুধাবন করতে পারে, এ দেশে তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার পথে প্রধান প্রতিপক্ষ মুসলিমরা। এও বুঝতে পারে, মুসলিমদের অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করা যাবে না। তাদের ঈমানি বলের সম্মুখে অস্ত্র আর মৃত্যুর ভয় নিষ্প্রভ। তাই ভিন্ন পথে হাঁটে তারা। ভাবতে থাকে, কীভাবে মুসলিমদের ঈমান দুর্বল করা যায়। এজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল একটি মোক্ষম অস্ত্র। সে সময়ই এগিয়ে আসে মির্জা কাদিয়ানির মতো নামধারী মুসলিম। নিজ স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে সে ইংরেজদের প্রশংসা আর চাটুকারিতায় সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। এসব দেখে তার বিশ্বস্ততা নিয়ে ইংরেজদের মনে আর সন্দেহ থাকে না। তারা খুঁজে পায় তাদের সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র, যা দিয়ে সহজেই তারা মুসলিমদের পিঠে ছুরি বিদ্ধ করতে পারবে। এরপরের ইতিহাস কারও অজানা নয়। ইংরেজদের আশকারা পেয়ে মির্জা শুরু করে তার নিকৃষ্ট খেলা। গিরগিটির মতো পাল্টাতে থাকে একের পর এক রং। এ বইয়ের পাতায় পাতায় করা হয়েছে বহুরূপী মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির পোস্টমর্টেম। শৈশব থেকেই শুরু হয়েছিল তার অদ্ভুতুড়ে সকল কাজের পালা। এরপর দিন যত গড়িয়েছে তার কর্মের পাতায় যুক্ত হয়েছে একের পর এক নিকৃষ্ট কাজ আর উদ্ভট সব দাবি। এ বইয়ে মির্জার শৈশব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সকল উদ্ভট কার্যকলাপ আর ভ্রান্তি তুলে ধরে লেখক কাদিয়ানিদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। বলেছেন, আমরা কাদিয়ানিদের কাছে মির্জার নবি হওয়ার প্রমাণ চাই না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোনো নবি আসবে না। আমরা তাদের এতটুকু বলব, তারা মির্জাকে প্রথমে একজন ভালো মানুষ হিসেবে প্রমাণ করে দেখাক। তারা সেটাও পারবে না।

অনূদিত এ গ্রন্থের মূল বইয়ের নাম থালি কা বেংগান। বাংলায় এ শব্দের অর্থ হয় অপদার্থ। লিখেছেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত লেখক ইশতিয়াক আহমাদ। পরবর্তী সময়ে তিনি আবদুল্লাহ ফারানি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। লিখেছেন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত,

চার খলিফার জীবনকথা ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের জীবনের টুকরো টুকরো গল্প। এ বইয়ের মধ্য দিয়েই আমার অনুবাদের হাতেখড়ি। শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আহসান ইলয়াস সাহেব বইটি আমাকে দিয়ে অনুবাদ অনুশীলন করতে বলেছিলেন। তাই এ বইয়ের সঙ্গে আলাদা আবেগ জড়িত। মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল কখন আমার কাঁচা হাতে লেখা এই অক্ষরগুলোকে ছাপার হরফে দেখতে পারব। অবশেষে হসন্ত প্রকাশন এগিয়ে এসেছে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে। তাদের জন্য রইল অশেষ শুভকামনা ও কৃতজ্ঞতা। প্রায় তিন বছর অনূদিত ফাইলটি আমার কাছে ছিল। এর মাঝে বেশকয়েকবারই বইটির মান বর্ধনে কাজ করেছি। আশা করছি পাঠকের ভালো লাগবে। তবুও মানুষ হিসেবে ভুল হয়েই যেতে পারে। তাই কোথাও কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের অবহিত করবেন।

—মাহদি হাসান
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

ভূমিকা

আলো নিজেই তার অস্তিত্বের জানান দেয়। তার আগমন সম্পর্কে কাউকে বলে দিতে হয় না, বরং তা নিজে নিজে উপলব্ধি করার বিষয়। আলো এমনই সত্য, যাকে কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না। আড়ালও করা যায় না। মানবজাতিকে সঠিক পথের আলো দেখানোর জন্য পৃথিবীতে অগুনতি নবি-রাসুল এসেছেন। প্রথম নবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম। আর সর্বশেষ নবি হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবি-রাসুলের জীবনী অধ্যয়ন করলে জানা যায়, আল্লাহ তাআলা তার নবুওয়তের দায়িত্ব প্রদানের জন্য এমন ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন, যাদের জীবনযাপন ছিল সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। সামসময়িক লোকদের কাছে যারা ছিলেন সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খোদাভীরুতা ও সৎকাজের প্রবণতা ছিল যাদের জন্মগত শোভা। এমন চমৎকার গুণাবলির বদৌলতেই তারা হেদায়েতের আকাশে জ্বলজ্বলে নক্ষত্রে পরিণত হয়েছিলেন। আর এই নক্ষত্ররাজির মাঝে আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা।

আমাদের প্রিয়নবিই ছিলেন সর্বশেষ নবি। তার পর আর কোনো নবি পৃথিবীতে আগমন করেননি। এটিই আল্লাহ তাআলার অমোঘ সিদ্ধান্ত। কেউ এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারবে না। পারবে না এর বিরোধিতা করতে। কিন্তু কিছু লোক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অবাধ লালসা চরিতার্থ করার জন্য নবুওয়তের মতো এমন মর্যাদাপূর্ণ বিষয়েও দখলদারত্ব চালানোর মতো হীন দুঃসাহস দেখিয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা এই নবুওয়তের ধারাবাহিকতা প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সমাপ্ত করে দিয়েছেন। তবে এই দখলদারত্বের সূত্রপাত হয়েছে নবিজির জীবদ্দশা থেকেই। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে ওই সকল মিথ্যা নবি দাবিদারদের বিস্তারিত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে এ সকল ভণ্ডদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের উপমহাদেশের মাটিও এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। এই মাটি থেকে ইংরেজ বেনিয়াদের হাতের পুতুল, মিথ্যা নবি দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির প্রকাশ ঘটে। তার উন্নতি আর অবনতির ধাপগুলো বেশ অদ্ভুত। কখনো সে নিজেকে দাবি করেছে মুজাদ্দিদে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনের সংস্কারক। কখনো দাবি করেছে প্রতিশ্রুত মাসিহের অনুরূপ কিংবা ইমাম মাহদি। কখনো নিজেকে আল্লাহর আদিষ্ট বলেছে, আবার কখনো এমন দুঃসাহসিক দাবিও করেছে

বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবন

উনিশ শতকের মধ্যভাগের কথা। এক লোক খাজনাদারী পরীক্ষায় ফেল করে। তারপর সে ভাবতে থাকে, এখন কী করা যায়? করার মতো কিছু না পেয়ে সে সোজা মিথ্যা নবুওয়তের দাবি করে বসে। মিথ্যা নবুওয়তের দাবি করার পর সে কী কী অপকর্ম করেছে তা জানার আগে, তার শৈশবকাল কেমন ছিল, সে সম্পর্কেও কিছু জেনে নেওয়া যাক। তবে সবার আগে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস শুনিয়ে নিই। তিনি বলেন, 'আমিই শেষ নবি, আমার পর আর কোনো নবি আসবে না।' এ ব্যাপারে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সময়ে এক ব্যক্তি নবুওয়তের মিথ্যা দাবি করে। আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করেন, 'কেউ যেন ওই ব্যক্তির কাছে তার দাবি করা নবুওয়তের দলিল না চায়। কেননা, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলে গেছেন, 'আমিই শেষ নবি, আমার পর আর কোনো নবি আসবে না।' সুতরাং কেউ যদি ওই ব্যক্তির কাছে দলিল-প্রমাণ চায়, তাহলে মনে হবে, যদি দলিল-প্রমাণ থাকে, তাহলে বুঝি এখনো নবি আসা সম্ভব।'

আমরা কাদিয়ানিদের কাছে কখনোই নবুওয়তের দলিল চাইব না। তবে একটা জিনিস অবশ্যই চাইব। সেটি হচ্ছে, তাদেরকে প্রথমে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানিকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। কিন্তু তারা এটুকুও পারবে না। কেননা, মির্জা ছিল আস্ত এক গিরগিটি। তার কাজ ছিল গিরগিটির মতো রঙ বদলানো। চলুন, প্রথমে তার শৈশবের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি। জেনে নিই, বাল্যকালে তার স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির পিতার নাম ছিল গোলাম মুর্তজা। তিনি ছিলেন ইংরেজ শাসকদের কর্মচারী। সে সময় উপমহাদেশে ছিল ইংরেজদের রাজত্ব। মির্জা গোলাম মুর্তজা অবসর পাওয়ার পর মাসিক সাত রুপি করে পেনশন পেতেন। এ সময় থেকেই মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির যতসব উদ্ভট ও অদ্ভুত কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

একদিন মির্জা কাদিয়ানি তার সমবয়সিদের সাথে খেলছিল। এক ছেলে তাকে বলল, যা, ঘর থেকে মিঠাই নিয়ে আয়। সে ঘরে গিয়ে সাদা সাদা জিনিস ভর্তি একটি পাত্র দেখতে পেল। ভাবল, এগুলোই মনে হয় চিনি। তাই সেগুলো পকেটে ভরে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। রাস্তায় এসে পকেট থেকে বের করে একমুঠ মুখে

ঢেলে দিলো। এরপর তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। তার শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আসলে সেই সাদা জিনিসগুলো চিনি ছিল না, সেগুলো ছিল লবণ!

আরেকদিনের ঘটনা। মির্জা রুটি খেতে বসেছে। রুটির সাথে মিশিয়ে খাওয়ার জন্য তার মায়ের কাছে তরকারি চাইল। তখন তাদের ঘরে কোনো তরকারি ছিল না। মির্জার মা বললেন, গুড় (মিঠাই) দিয়ে খাও। মির্জা বলল, গুড় দিয়ে খাব না। তার মা বললেন, তাহলে চিনি দিয়ে খাও। মির্জা বলল, না চিনি দিয়েও খাব না। এবার তার মা বললেন, আচ্ছা তাহলে আচার দিয়ে খাও। মির্জা বলল, আমি আচার দিয়েও খাব না। মির্জার মা এবার রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, যাও তাহলে মাটি দিয়ে খেয়ে নাও। মির্জা তাই করল। রুটির সাথে মাটি মাখিয়েই খেতে লাগল। আসলে মির্জার আকল-বুদ্ধিই ছিল এমন অসম্পূর্ণ! বুদ্ধি-বিবেচনার দিক দিয়ে সে ছিল খালি কলসের মতো।

বাল্যকালে মির্জার পাখি ধরার নেশাও ছিল। পাখি ধরে ধরে অসহায় পাখিগুলোকে সে চাকু দিয়ে জবাই করত। এটা করে সে অনেক মজা পেত। একদিন পাখি জবাই করার জন্য কোনো চাকু খুঁজে পেল না। তাই সে নলখাগড়া দিয়ে ওই পাখিকে জবাই করতে চাইল। ভাবতে পারেন মির্জা কতটা নির্দয় আর পাষাণ ছিল! নলখাগড়া দিয়ে কি কেউ কখনো পশুপাখি জবাই করে?

একদিন তাদের ঘরে মুরগি জবাই করার প্রয়োজন হলো। ঘরে অন্য কেউ না থাকায় মির্জাকেই মুরগি জবাই করতে বলা হলো। সে ছুরি নিয়ে মুরগি জবাই করার চেষ্টা করল। কিন্তু কী হলো? মুরগিটা বেঁচে গেল আর ছুরি গিয়ে লাগল মির্জার আঙুলে। মুরগির বদলে বেচারা মির্জার আঙুলটাই জবাই হয়ে গেল ।

মির্জা কখনো ঋতু পরিবর্তন টের পেত না। অন্যরা এ কথা কীভাবে জানল? কারণ, শীতকালে সে যে পোশাক পরত, গরম এসে গেলেও সেই পোশাক খুলত না। অধিকাংশ সময় সে উল্টো জুতো পরে থাকত। সে বুঝতেও পারত না, সে যে উল্টো জুতা পরেছে। একসময় তার মা জুতায় চিহ্ন লাগিয়ে দিলে সে উল্টো আর সোজা বুঝতে পেরেছিল। চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়ার পর ঠিকভাবে জুতা পরতে জানলেও সে কিন্তু কখনো ঘড়ি দেখে সময় বলতে পারত না। সংখ্যা গুনে গুনে হিসাব করে তারপর সে সময় দেখত।

মনোবিদগণ বলেন, এ ধরনের ছেলেরা একেবারেই বোকা আর গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকে।

শুধু বাল্যকালেই নয়, বড় হওয়ার পরও মির্জার এমন অনেক বোকামি দেখা গেছে। যেমন, একবার এক লোক তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। ঘর থেকে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে জানিয়ে দেয়া হলো, মির্জা মসজিদে আছেন। মসজিদে গিয়ে লোকটি মির্জাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। আগন্তুক আবার মির্জার ঘরে এলেন। এবার তাকে বলে দেওয়া হলো, দেখবেন মির্জা হয়তো মসজিদের কোনো

মির্জার বিতর্কের নেশা

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলিম, হিন্দু আর শিখরা একসঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তিন জাতিই চাইত, যে করেই হোক ইংরেজ বেনিয়াদেরকে এই ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে। ইংরেজরা সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের নাম দেয় গাদ্দারির যুদ্ধ। মির্জা সম্পর্কে এ যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশেষ সংবাদ হচ্ছে, তার পিতা এ যুদ্ধে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ইংরেজদের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। ৫০ জন ঘোড়সওয়ার সরবরাহ করে দিয়েছিলেন। এ কথা নিজের থেকে বানিয়ে লিখছি না। মির্জা নিজেই তার এক বইয়ে এ তথ্য দিয়েছেন। আসলে আমার এ বইয়ের সকল তথ্য মির্জার লেখা বইগুলো থেকেই সংগ্রহ করে সাজানো হয়েছে। ইংরেজদের সেবাদাসরা তো কখনোই মুসলমানদের ভালো চাইত না। তবুও এমন লোকই যদি নবুওয়তের দাবি করে বসে, তাহলে এ নিয়ে হতভম্ব না হয়ে পারা যায় না।

মির্জা ১৮টি বছর ইংরেজদের সেবা করেছে। নিজের কলম দিয়ে ইংরেজদের অনেক প্রশংসা করেছে। তাদের প্রশংসায় বই লেখেছে। এক্ষেত্রে 'তুহফায়ে কায়সারিয়া' আর 'সেতারায়ে কায়সারিয়া' নামের বই দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দুই বইয়ে মির্জা ইংরেজদের প্রশংসায় আকাশপাতাল এক করে ফেলেছে। এসব দেখে ইংরেজ সরকার ভেবে নিয়েছিল, এরা তো আসলেই ইংরেজদের বিশ্বস্ত। ইংরেজদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাই ইংরেজ সরকার ফন্দি আঁটল, এদের দ্বারা মুসলমানদের পিঠে সহজেই ছুরি বিদ্ধ করা যাবে। এদিকে মির্জা আর্থিক অনটনে ভুগছিল। তাই ইংরেজরা তাকে আর্থিক সাহায্য করে নিজেদের কার্যসিদ্ধির পরিকল্পনা করল। তাকে বলা হলো—নবি হওয়ার প্রস্তুতি নিতে।

এই লক্ষ্যে মির্জা অমুসলিমদের সঙ্গে বিতর্ক শুরু করে। প্রথমে হিন্দুদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়। এরপর খ্রিষ্টানদের মোকাবিলায় নামে। এভাবেই মির্জার খ্যাতি অর্জন শুরু হয়। আরও বিখ্যাত হওয়ার জন্য সে লোকদের কাছে বানিয়ে বানিয়ে আজগুবি সব স্বপ্নের কথা বলতে থাকে। আর তাদেরকে ওই স্বপ্নের মনগড়া ব্যাখ্যা শোনাতে থাকে। সে লোকদের বলে বেড়াত, আপনাদের কোনো স্বপ্ন থাকলে আমাকে জানান, আমি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেবো। এভাবেই মির্জা একটি বই লেখার পরিকল্পনা করে। এ সংক্রান্ত কাজে তাকে একবার লাহোর যেতে হয়। তখন লাহোরে দিয়ানন্দ স্বামী নামে অনেক বিখ্যাত একজন হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে তর্কবিতর্ক করতেন। লাহোরে পৌঁছে এ অবস্থা দেখে মির্জা ঘোষণা করে দিলো, এমন কেউ কি আছে, যে আমার সাথে বিতর্ক করবে?

তখনও মির্জা নবুওয়তের দাবি করেনি। তার ওপর ওহি অবতীর্ণ হয়, এ কথাও বলেনি। তাই এ ঘোষণা শুনে সেখানকার মুসলিমরা অনেক খুশি হয়। কারণ, তারা দিয়ানন্দ পণ্ডিত আর খ্রিষ্টান পাদরিদের মিথ্যা ও অনর্থক কথাবার্তা শুনতে শুনতে আর ধোঁকাবাজি দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। খ্রিষ্টান পাদরিরাও এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে।

এই বিতর্কের মাধ্যমে মির্জা বেশ খ্যাতি লাভ করে। তারপর কাদিয়ানে ফিরে আসে। এবার সে একটি বই লেখার ঘোষণা দেয়। এও ঘোষণা দেয় যে, বইটি হবে ৫০ খণ্ডের। তাই লোকদের থেকে চাঁদা আদায়ের আবেদন জানানো হয়। বেহিসাব চাঁদা জমা হতে থাকে। সে বইটির ব্যাপারে বলা হয়েছিল, তা কুরআন অনুসারে লেখা হবে। আর সেটি পাঠ করে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহন করবে। এ ঘোষণা শুনে লোকেরা আরও বেশি করে চাঁদা প্রদান করে। মির্জা এই মর্মে আরও একটি আকর্ষণীয় ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি এই বইয়ের দলিল খণ্ডন করতে পারবে তাকে ১০ হাজার রুপি পুরস্কার দেওয়া হবে। এ কথা শুনে চারদিক থেকে ব্যাপক হারে চাঁদা আসা শুরু হয়।

বই ছাপানোর আগেই মূল্য নির্ধারণ করে ফেলা হয়। এই মূল্য কয়েকবার পরিবর্তনও করা হয়। প্রথমে পাঁচ রুপি, তারপর ১০ রুপি, তারপর ২৫ রুপি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু লোকদের থেকে ২৫ রুপির বদলে শত শত রুপি আদায় করা হয়েছে। মির্জা এই এক বইয়ের জন্য একের পর এক ঘোষণা দিয়ে খুব প্রোপাগান্ডা চালায়। কিন্তু সবশেষে বইটির মাত্র চার খণ্ড ছাপানো হয়। বইটির নাম রাখা হয় 'বারাহিনে আহমাদিয়্যাহ'। লোকেরা বাকি খণ্ডের অপেক্ষা করতে থাকে। কারণ, তারা আগে থেকেই মূল্য পরিশোধ করে রেখেছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় চলে যাওয়ার পরও আর কোনো খণ্ড ছাপানো হলো না। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে। তৃতীয় খণ্ড ১৮৮২ সালে আর চতুর্থ খণ্ড ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এদিকে লক্ষ করে ১৮৮৮ সালের মধ্যেই পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মির্জা পঞ্চম খণ্ড তার জীবনের শেষভাগে এসে ২৩ বছর পর প্রকাশ করে । অথচ সে ৫০ খণ্ড লেখার দাবি করেছিল। কিন্তু মাত্র পাঁচ খণ্ড লিখেই শেষ। তখন লোকেরা আপত্তি জানিয়ে বলল, মির্জা সাহেব, আপনি তো ৫০ খণ্ড লেখার ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু লিখেছেন মাত্র পাঁচ খণ্ড! এটা কি ঠিক হলো? কোনো মুসলমানের জন্য কি এক কথা বলে আরেক কাজ করা মানায়? আবার আপনি সেই বইয়ের জন্য অগণিত চাঁদা উঠিয়েছেন। লোকেরা ৫০ খণ্ডের হিসাব করে আপনাকে সেই চাঁদা পাঠিয়েছিল। কিন্তু আপনি এটা কী করলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মির্জা যে জবাব দিয়েছিল, সেটি মির্জার ধূর্ত চরিত্রেরই সত্যায়ন করে।

আমিই সেই লোক

নিজের বয়স সম্পর্কে করা ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মির্জা তত বছর বাঁচতে পারেনি। বরং তার চেয়ে কম বয়সে তার মৃত্যু হয়। মির্জা দাবি করেছিল, আমি ৮০ বছর বাঁচব। কিন্তু সে ১৮৩৯ অথবা ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৯০৮ সালে মারা যায়। তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। এটি কোনো দীর্ঘ বয়স ছিল না। তাই বোঝাই যাচ্ছে, মির্জা মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কাদিয়ানিদের আমরা অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে পরামর্শ দিচ্ছি। তারা যেন তাদের চোখ থেকে ধোঁকার মোটা পট্টি খুলে নেয় আর মির্জার ভ্রান্ত দাবিগুলো খেয়াল করে দেখে সরল সঠিক পথে চলে আসে।

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরিকে লিখিত চিঠিতে মির্জা আরেকবার নিজেকে প্রতিশ্রুত মাসিহ দাবি করে। এর আগেও কয়েকটি বইয়ে সে দাবি করেছে, আমিই প্রতিশ্রুত মাসিহ। তার লিখিত *ইজালায়ে আওহাম* গ্রন্থে সে স্পষ্টভাবে লেখেছে, আমিই প্রতিশ্রুত মাসিহ। *কাশতিয়ে নুহ* নামক গ্রন্থে সে লেখেছে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মাসিহ, যাকে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরে দাফন করা হবে। অর্থাৎ, নিজেকে প্রতিশ্রুত মাসিহ প্রমাণ করার জন্য সে লিখে বসল, তাকে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দাফন করা হবে। মির্জার দাবি ছিল, ঈসা আলাইহিস সালাম চলে গেছেন। যে মাসিহের আগমনের কথা রয়েছে আমিই সেই মাসিহ। এজন্য সে নিজের দাফনের ব্যাপারেও এই ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলল যে, তাকে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দাফন করা হবে। কিন্তু হলো কী! মির্জা মারা গেল লাহোরে। তার লাশ বহন করে নিয়ে আসা হয় কাদিয়ানে। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে একটি বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেল, আসলে কাদিয়ানিরাও জানত, মির্জা মিথ্যা নবি ছিল। কারণ, তারা যদি মির্জাকে সত্য নবি বলে বিশ্বাস করত, তাহলে তারা মির্জার লাশ নিয়ে মদিনায় যেত। তাহলেই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাকে মদিনায় দাফন করা সম্ভব হতো। কাদিয়ানিদের নিকট প্রশ্ন হলো, তখন কি মির্জার লাশ মদিনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? তারা তার লাশকে মদিনায় নিয়ে যায়নি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেল, তারা নিজেরাও বিশ্বাস করত মির্জা মিথ্যা নবি ছিল। তাকে সত্য মনে করলে তার লাশ তারা মদিনায় নিয়ে যেত।

আমরা কাদিয়ানিদের একটি প্রশ্ন করব। যদি উত্তর না দিতে পারে তাহলে তাদের বলব, তারা যেন তওবা করে নেয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন। সে সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাদের মাঝে ইবনু মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ বিচারক হয়ে আসবেন। তিনি

মির্জার বিপরীতমুখী কথাবার্তা

নিজের এক বইয়ে মির্জা কাদিয়ানি লেখেছে—

'আমি কখনোই হাকিকি অর্থাৎ প্রকৃত নবুওয়তের দাবি করিনি। আমি মুসলমান ভাইদের কাছে স্পষ্টভাবে বলছি, যদি তারা ওই ধরনের শব্দের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে তারা যেন আমাকে শুধু মুহাদ্দিস মনে করেন। ওই শব্দ দ্বারা আমার মুহাদ্দিস হওয়া উদ্দেশ্য ছিল।'

এ বক্তব্যে মির্জা স্পষ্টভাবে স্বীকার করল যে, সে কখনোই মূল এবং আসল নবুওয়তের দাবি করেনি। এছাড়া প্রতিশ্রুত মাসিহ হওয়ার ও অন্যান্য যত দাবি ও ঘোষণা সে করেছিল, সবগুলো থেকেই পিছু হটে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে সে। এর বিপরীতে তাকে শুধু মুহাদ্দিস হিসেবে মেনে নেওয়ার কথা বলে। এর অর্থ এমন দাঁড়ায় যে, আমি তো মুহাদ্দিস নই কিন্তু আপনারা দয়া করে আমাকে মুহাদ্দিস মেনে নিন।

কিন্তু অপরদিকে সে তার 'এক গলতি কা ইজালা' নামক বইয়ে লেখেছে, 'আমি নবুওয়ত এবং রেসালাত অস্বীকার করি না। অর্থাৎ আমি নবি এবং রাসুল।'

এবার তার আরেকটি ঘোষণা শুনুন। সে তার এক বইয়ে স্পষ্টভাবে লেখেছে, 'যে সকল স্থানে আমি নবি হওয়ার কথা অস্বীকার করেছি, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমি কোনো শরিয়তধারী নবি নই এবং আমি পরিপূর্ণ নবিও নই। এই উম্মতের মধ্যে এখন আর কোনো শরিয়তধারী নবি আসবেন না।'

কিন্তু আরেক বইয়ে সে লেখেছে—

শরিয়ত কাকে বলে জেনে নাও। শরিয়তের সংজ্ঞা হলো, যিনি নিজের ওপর অবতীর্ণ ওহির মাধ্যমে কিছু হুকুম বর্ণনা করেছেন, আর নিজের উম্মতের জন্য একটি বিধান নির্ধারণ করেছেন, তিনিই হচ্ছেন শরিয়তধারী নবি। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমিও শরিয়তধারী নবি। কেননা, আমার ওপরও অহি অবতীর্ণ হয়।

খেয়াল করুন, প্রথমে সে লেখল, নবি হওয়ার কথা আমি অস্বীকার করি না। তবে আমি শরিয়তধারী নবি হওয়ার কথা অস্বীকার করি। আমি কোনো শরিয়ত নিয়ে আসিনি। মানে আমি শরিয়ত বিহীন নবি। তারপর আবার লেখল, আমি শরিয়তধারী নবি। এই ছিল মির্জার মুখোশ। একটি দুটি নয়, বরং হাজারো মুখোশ ছিল তার। আর কাদিয়ানিরা এই হাজারো মুখোশকেও সঠিক মনে করে।

মির্জার মৃত্যুর পর কাদিয়ানিদের প্রচার-প্রসারকারী লেখকরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। রাবওয়া থেকে প্রকাশিত 'জামাআতে আহমদিয়া কা মাসলাক' নামক বইয়ে লেখা হয়েছে, এখন কোনো নতুন শরিয়ত বিশিষ্ট নবি আসবেন না। এই বইয়ে মির্জার লেখিত 'তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়্যাহ' বইয়ের ২৪ নম্বর পৃষ্ঠার

মানুষ নাকি গিরগিটি

কখনো মির্জা লেখেছে—

আমার পূর্বপুরুষরা চীন সীমান্ত দিয়ে পাঞ্জাবে এসেছে (অর্থাৎ আমি চীনা বংশের লোক)।

আবার লেখেছে—

আমি পারস্যের (ইরান) বংশধর।

আমি মোঙ্গল বংশধর।

আমি আলাবি (আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর) না হলেও, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর।

আমার কয়েকজন দাদি ছিলেন সাইয়েদ বংশীয়।

খেয়াল করে দেখুন, মির্জার কতগুলো বংশ। চীনা, পারস্য, মোঙ্গল, ফাতেমি ও সাইয়েদ, সব বংশের সমাহার ঘটেছিল তার মধ্যে।

সে এর চেয়ে বড় কথাও লেখেছে—

আমি পারস্য আর ফাতেমীয় বংশের সংমিশ্রণে তৈরি।

দেখুন, এবার সে মানুষ থেকে শঙ্করজাত ও হয়ে গেল। আরও কী কী অবান্তর কথা সে লেখেছে—তা একটু লক্ষ করুন।

'আমি হোসাইন থেকে উত্তম।'

'আমিই প্রতিশ্রুত মাসিহ।'

'আমাকে মাসিহ এবং মাহদি বানানো হয়েছে।'

নোট : হাদিস অনুযায়ী ঈসা আলাইহিস সালাম এবং ইমাম মাহদি দুজন আলাদা মানুষ। কিন্তু মির্জা দুজনকেই নিজের মাঝে একত্র করতে চেয়েছে।

সে আরও লেখেছে—

আমি পূর্ববর্তী মাসিহ থেকে সবদিক দিয়ে অধিক সম্মানিত। (নাউজুবিল্লাহ)

আল্লাহ প্রথমে আমার নাম মারইয়াম লিখেছিলেন। তারপর ঈসা রেখেছেন।

কী হাস্যকর ব্যাপার! খেয়াল করেছেন? মির্জা প্রথমে মারইয়াম ছিল। মানে সে প্রথমে মহিলা ছিল। তারপর পুরুষ হয়েছে।

'আল্লাহ আমার নাম বাইতুল্লাহ রেখেছেন।'

এবার সে মানুষ থেকে আল্লাহর ঘরও হয়ে গেল!

'আমি হাজরে আসওয়াদ (কালোপাথর)।'

প্রথমে সে আল্লাহর ঘর হলো। তারপর কালোপাথর হয়ে গেল। দেখা গেল, তার কোনোকিছুই হওয়া বাকি থাকল না। কিন্তু কাদিয়ানিদের কোনো বইয়ে এ কথা পাওয়া যায়নি যে, কেউ মির্জাকে কালোপাথর মনে করে চুমু দিয়েছে। মনে হয়, মির্জা আর তার অনুসারীরা এ কথা ভুলে গিয়েছিল। কাদিয়ানিদের উচিত ছিল, তাদের মসজিদের কোনো একপাশে মির্জাকে বসিয়ে প্রতিদিন চুমু দেওয়া।

সে আরও লেখেছে—

সত্য খোদা তিনিই, যিনি কাদিয়ানে তার রাসুলকে প্রেরণ করেছেন।

এখানে সত্য খোদা বলে মির্জা কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আমাদের জানা নেই। মির্জা তার জন্য কিছু নামও রেখেছে। সেই নামগুলো শুনে নেওয়া যাক। সে লেখেছে—

আমি আদম। আমি শিস। আমি ইবরাহিম। আমি ইসহাক। আমি ইয়াকুব। আমি ইউসুফ। আমি মুসা। আমি দাউদ। আমি সুলাইমান। আমি ইয়াহইয়া। আমি মুহাম্মদের ছায়া। আমি আহমদ।

আরও লেখেছে, 'এ সমস্ত নাম আমার জন্য রাখা হয়েছিল।'

মানে এই উম্মতের মধ্যে আমার মাধ্যমে সমস্ত নবিগণ আবার জন্মলাভ করেছেন। এবার তার দাবিগুলো একটু খেয়াল করুন, সে দাবি করেছে—'আমি শঙ্করজাত।

যখন এতগুলো নবিকে সে নিজের মধ্যে একত্রিত করার দাবি করে ফেলল, তাহলে সে তো শঙ্কর জাতেরই। মির্জা এতেও থেমে থাকেনি। মানে নিজের ওপর সমস্ত নবিদের নাম প্রয়োগ করেও তার শান্তি হয়নি। সে আরও লেখেছে—

আমি ফেরেশতা। আমি মিকাইল। আমি খোদার অনুরূপ (আগে সে শুধু মাসিহের অনুরূপ ছিল। এখন আল্লাহর অনুরুপও হয়ে গেল। নাউজুবিল্লাহ)। আমি আল্লাহকে প্রকাশকারী। আমি আল্লাহর পুত্র (এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যাতে খ্রিষ্টানরাও বাদ না পড়ে), আমি আল্লাহর পিতা। আমি আল্লাহর বিবি।

সুরা ইখলাসের মধ্যে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তিনি কারও পিতাও নন, পুত্রও নন। মির্জা এর সবকিছুই অস্বীকার করল। সে আরও লেখেছে—

আমাকে জীবিত এবং মৃত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

নোট : মির্জার যদি আসলেই এই ক্ষমতা থাকত তাহলে তো সে কবেই মুহাম্মদি বেগের স্বামীকে মেরে ফেলত। এমনিভাবে খ্রিষ্টান পাদরি আবদুল্লাহ আতহাম, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরিকেও ছেড়ে দিত না। অথচ সে তাদের মৃত্যুর চ্যালেঞ্জ করেছিল!

আরেক জায়গায় সে লেখেছে—

আমি খোদার আসনে আসীন। আমিই সৃষ্টিকর্তা। আমিই খোদা। আমি রুদ্র গোপাল (হিন্দুদের খুশি করার জন্য)। রুদ্র গোপালকে যুদ্র গোপালও বলা হয়। তার নামও আমাকে দেওয়া হয়েছে।

মির্জার স্বাস্থ্যের অবস্থা

এবার জেনে নেওয়া যাক মির্জা কেমন সুস্বাস্থ্যবান ছিলেন।

তার স্বাস্থ্যের কেমন অবনতি ঘটেছিল, ইতোমধ্যে আপনারা তা জেনেছেন। আল্লাহ তাআলা তার যে সকল বান্দাকে নবুওয়ত দিয়েছেন তারা সকলেই সুন্দর চেহারা, সুস্থ শরীর, সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যেরও অধিকারী ছিলেন। মির্জাকে আমরা সে অনুযায়ী হিসেব করতে পারব না। কেননা, নবুওয়তের সময় শেষ হয়ে গেছে। আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত সকল আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মির্জা কেমন মানুষ ছিল তা বোঝানো। এবার শুনে নিন মির্জার স্বাস্থ্যগত অবস্থা নিয়ে কিছু কথা। এগুলো মির্জার লিখিত বই এবং অন্যান্য কাদিয়ানিদের বই থেকে নেওয়া হয়েছে। আমরা বানিয়ে লিখছি না। মির্জা এক জায়গায় লেখেছে—

> আমার দুইটি রোগ রয়েছে। একটি ওপরে আরেকটি নিচে। অর্থাৎ মিরাক (হিস্টেরিয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃতি) আর অধিক পরিমাণে পেশাব করা।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, এই মিরাক (মস্তিষ্ক বিকৃতি) আবার কেমন রোগ? ডাক্তাররা বলেছেন, মিরাক হলো মাথার এক ধরনের রোগ। এটাকে জুনুন অর্থাৎ পাগলামিও বলা হয়। মির্জা বলে দিলেন, তার ওপরের অংশে পাগলামির রোগ ছিল।

আর তার বারংবার পেশাব হতো। মির্জা নিজেই লেখেছে, মাঝে মাঝে আমাকে একদিনে ১০০ বারের মতো পেশাব করতে হতো। বিষয়টি অংকে হিসাব করে আমরা অনেক চমকে গেলাম। আপনারাও হিসেব করুন। একজন মানুষের পেশাব করতে, তারপর ইস্তিঞ্জা করতে, তারপর হাত ধৌত করতে কম করে হলেও পাঁচ মিনিট সময় লাগে। আর যার পেশাবের রোগ আছে তার আরও বেশি সময় লাগে। আমরা এখানে গড় হিসাবে পাঁচ মিনিট করে ধরে নিলাম। যদি দিনে ১০০ বার পেশাব করে তাহলে ৫০০ মিনিট লেগে যায়। সকাল থেকে নিয়ে রাতে ঘুমানোর সময় পর্যন্ত সাধারণত ১২ অথবা ১৬ ঘণ্টা সময় হয়ে থাকে। ৫০০ মিনিটে আট ঘণ্টারও বেশি সময় হয়ে যায়। তাহলে ১৬ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা লাগত তার পেশাব করার জন্য। আর যদি ২৪ ঘণ্টার হিসাবও ধরা হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে মির্জার একদিনের ৮ ঘণ্টা চলে যেত পেশাব করার জন্য। আট ঘণ্টা ঘুমানোর জন্য। আর আট ঘণ্টা অন্য কাজ করার জন্য। তাহলে এই অসহায় মিথ্যা নবি তার উম্মতকে কতটুকু সময় দিতে পারত? ভেবে দেখুন।

মির্জার টিবি বা যক্ষারোগ ছিল। এটা ছিল তার জন্মকাল থেকেই। এ রোগের চিকিৎসার জন্য তাকে পা ধুয়ে পানি খাওয়ানো হতো। মির্জার বেহাল দশা হয়ে গিয়েছিল এ রোগের কারণে।

আয়না

আমরা এখন মির্জার মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ দেবো। আপনারা জানেন, কোনো মহিলা নবি হতে পারে না। কিন্তু মির্জা লেখেছে, 'আমি মারইয়াম।'

কোনো কবি নবি হয় না। কিন্তু মির্জা কবিও ছিল। তার কবিতার বইয়ের নাম ছিল 'দুররে সামিন'।

কোনো নবি লেখক হয় না। কিন্তু মির্জা প্রায় ১০০টি বই লেখেছে।

নবিগণ পরিপূর্ণ বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হন। পরিপূর্ণ অনুভূতি শক্তির অধিকারী হন। কিন্তু মির্জার লেখাগুলো থেকে বোঝা যায়, তার মাঝে পাগলামি ছিল। স্মৃতিশক্তি কম ছিল। তার অনুভূতি আর জ্ঞান-বুদ্ধির অবস্থার কথা কী বলব! মাটি দিয়ে রুটি খেয়ে ফেলত সে। নির্বোধ লোকেরাই এমন করে থাকে।

নবিগণের কোনো শিক্ষক হয় না। মির্জার লেখা অনুযায়ী তার তিন জন শিক্ষক ছিল। তার মধ্যে একজন সাহাবিদেরকে গালি দিত।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুওয়তের দাবিদার মিথ্যাবাদী। আর মির্জা দাবি করেছে, আমি নবি ও রাসুল। আমার ওপর ওহি আসে। মির্জা অহি নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার নাম রেখেছে পিটি পিটি। এ কথা সে নিজেই লেখেছে।

নবি কোনো কর্মচারী অথবা চাকর হন না। অথচ মির্জা ইংরেজদের চাকরি করত।

নবি যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। কিন্তু মির্জা মারা গেছে লাহোরে। তাকে দাফন দেওয়া হয়েছে কাদিয়ানে। এদিকে সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তার দাফন হবে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মোবারকে।

সে নিজেকে ঈসা এবং মাসিহ বলত। অথচ ঈসা আলাইহিস সালাম পিতা ছাড়া কুদরতিভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর মির্জার পিতা ছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম তার মায়ের কোলে কথা বলেছেন। কিন্তু মির্জার ব্যাপারে এমন কোনো কথা প্রমাণিত নেই। ঈসা আলাইহিস সালাম অনেক উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের দৃষ্টান্ত। কিন্তু মির্জা অন্যদেরকে গালিগালাজ করত। তার বইগুলো গালিগালাজ আর অভিশাপে ভরপুর। ঈসা আলাইহিস সালাম উচ্চতা ছিল মধ্যম আকারের। মির্জা ছিল এর বিপরীত।

ঈসা আলাইহিস সালাম খুব সাধারণ খাবার খেত। আর খুব কম খেত। কিন্তু মির্জা অনেক মুরগি ভাজা খেয়েছে। ডিম ভাজা খেয়েছে। তার এতই খানার চাহিদা

মির্জার যন্ত্রণাকর মৃত্যু

এখন আমরা মির্জার যন্ত্রণাকর মৃত্যুর কথা বলব।

মির্জা মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরিকে চ্যালেঞ্জ করে লেখেছিল—

আপনার কথা অনুযায়ী যদি আমি এতই মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি, তাহলে আমি আপনি জীবিত থাকতেই ধ্বংস হয়ে যাব। কারণ, আমি জানি মিথাবাদীর জীবন দীর্ঘ হয় না। একসময় সে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ব্যর্থ হয়ে তার শত্রুর জীবদ্দশায়ই মৃত্যুবরণ করে। তার ধ্বংস হওয়াই উত্তম। যাতে করে সে আল্লাহর বান্দাদেরকে ধ্বংস করতে না পারে। আর যদি আমি মিথ্যাবাদী না হই, তাহলে আশা করি আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে তার উচিত সাজা দেবেন। আর তা কোনো মানুষের হাতে হবে না। যেমন, প্লেগ, কলেরা ইত্যাদি রোগের মাধ্যমে আমার জীবনকালেই যদি তার মৃত্যু না হয়, তাহলে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নই।'

অর্থাৎ, মাওলানা সানাউল্লাহ প্লেগ অথবা কলেরা রোগের কারণে মারা গেলে মির্জা সত্য প্রমাণিত হবে। তা না হলে মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

সবশেষে মির্জা বলেছে, এগুলো আমি আমার পক্ষ থেকে বলিনি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেছি।

এ বক্তব্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মির্জা তার জীবদ্দশায় মাওলানা সানাউল্লাহ প্লেগ অথবা কলেরা রোগের কারণে মারা যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। আর বলেছে, মিথ্যাবাদী সত্যবাদী জীবিত থাকতেই ধ্বংস হয়ে যায়। সত্যবাদী জীবিত থাকে। মিথ্যাবাদীর জীবন দীর্ঘ হয় না, ইত্যাদি।

আপনারা পড়লেন তো?

মির্জা লেখেছে, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে মাওলানা সানাউল্লাহ জীবিত থাকতেই মারা যাব। আরও লেখেছে, 'মিথ্যাবাদী লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ব্যর্থ হয়ে তার শত্রুর আগেই মৃত্যুবরণ করে।' অতঃপর সে প্লেগ অথবা কলেরা রোগের মাধ্যমে তার মৃত্যুও কামনা করে।

কিন্তু মির্জাই ১৯০৮ সালে কলেরা রোগের কারণে মারা যায়। মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরির কিছুই হয়নি। তিনি মির্জার মৃত্যুর পরও ৪০ বছর জীবিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ইন্তেকাল করেন। মির্জার মৃত্যুর একদিন আগে তার শ্বশুর নবাব মীর নাসির মির্জার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন মির্জা তার নিজের মুখেই বলেছিল, 'নবাব সাহেব, আমার কলেরা রোগ হয়ে গেছে।'

মির্জার হিসাবের খাতা

বলতে গেলে মির্জা কাদিয়ানির মাঝে কোনো ভালো বিষয়ের অস্তিত্ব ছিল না। খুঁজে খুঁজে যা পেয়েছি, তা তুলে ধরছি।

মির্জা অনেক বই লেখেছে। তার সময়ে তাকে কলমের রাজা বলা হতো। তার সব বইয়েই লেখকের পরিচয় দিতে গিয়ে এ কথা লেখা ছিল। মির্জার বইগুলো কাদিয়ানিদের কাছে আসমানি কিতাবের সমতুল্য। আর যদি আমরা তাদেরকে বলি, চলো, আমরা তাহলে তার বইয়ের মাধ্যমেই আলোচনা করি, তখন যেন তাদেরকে সাপে কামড় দিত। সাথে সাথেই তারা বলত, না, চলো মাসিহের জন্ম মৃত্যুর কথা আলোচনা করি। মির্জার বই নিয়ে কথা বলতে গেলে যেন তারা মরার আগেই একবার মরে যেত। মির্জার বইগুলো পড়ে চমৎকার কিছু বিষয় পাওয়া গেছে। যা হয়তো অনেকেই খেয়াল করেননি। আমরা সেই বিষয়গুলো উল্লেখ করব। এ বিষয়ে আলাদা একটি বই লিখে ফেলা যাবে। এগুলো পড়ে আপনারাও মির্জার দক্ষতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবেন। এ বিষয়ে এত দক্ষতা খুব কম লোকেরই আছে। কাদিয়ানিদের অবশ্যই এগুলো পড়া উচিত। হতে পারে তারা আরও কিছু নতুন বিষয় পাবে, আর কোনো চিন্তাভাবনা না করেই তা মেনে নেবে।

হতে পারে এগুলো পড়ে আপনারা বলে উঠবেন, সত্যি সত্যিই কি এগুলো মির্জার বইয়ে লেখা আছে? হ্যাঁ, এসব মির্জার বইয়ে লেখা আছে। বরং আরও বেশি লেখা আছে। এতক্ষণ যা বললাম, এবার চলুন চাক্ষুষ দেখে আসি।

একজন ভদ্র লোক তার বিপক্ষের লোকের সাথে অনেক ভদ্রতার সঙ্গে কথা বলে। কোমল ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলে। অশ্লীল গালিগালাজ করে না। পৃথিবীর কোনো সম্মানিত লোক কাউকে গালি দিতে পছন্দ করে না। এবং সে অন্যের থেকে গালি খেতেও পছন্দ করে না। কিন্তু মির্জা নিজের বইয়ে তার বিরোধীদের ক্ষেত্রে গালি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করেনি। সে দলিল প্রমাণ না দিয়ে গালির মাধ্যমেই তার কার্যসিদ্ধির প্রয়াস চালিয়েছে। আপনারা এতক্ষণ মির্জার কাজ সম্পর্কে ভালোই অবগত হয়েছেন। তার কাজ ছিল তার মিথ্যা নবুওয়তের আস্তানা সাজানো। এজন্য বিরোধীদের গালিগালাজ করা ছিল তার অন্যতম অস্ত্র। সে মুসলিমদেরকে কত নিকৃষ্ট ভাষায় গালি দিয়েছে তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

'হে মূর্খের দল, তোমরা সবাই হিজড়া।' (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪০২)